সংবাদ

তারিখ ... 18 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১...

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ ব্যাংকে লগ্নির নামান্তর

এ এন রাশেদা

'২০১০ সালের শিক্ষানীতি'-১৯৭২ এর সংবিধানের অঙ্গীকার অনুযায়ী রচিত হয়নি। কারণ '৭২-এর সংবিধান ফিরে আসে ৩০ জুন ২০১১। কিন্তু ২০১০-শিক্ষানীতি সংসদে পাস হয় ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার-শিক্ষানীতি-২০১০-এ প্রতিফলিত হবে না; এটাই স্বাভাবিক। এই শিক্ষানীতিতে যেমন শিক্ষার দর্শন নেই, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নেই, নেই সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশ ও সমাজ উন্নয়নের সার্বিক কোনো পরিকল্পনা।

১৯৭৪ এর ড. কুদরাত-এ খুদা কমিশনের রিপোর্টে যেমন বলা হয়েছিল 'শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়নের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানে যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।

কাজেই শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে ২০১৬'-১৭তে যে বাজেট প্রণীত হবে– তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধাবিত হবে না। তাই ২০১৬ সালে '৭২-এর সংবিধানের ভিত্তিতে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে– শিক্ষা বাজেটে ৩০% এবং জাতীয় আয়ের ৭% বরাদ্দ করতে হবে। ধনিক শ্রেণীর হাত থেকে শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হলে এই বরাদ্দ একান্তই প্রয়োজন হবে যখন জাতীয় বাজেটের আকার হবে সম্ভবত প্রায় ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা ১১-৫-২০১২ তারিখের দৈনিক সংবাদের এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, 'অর্থবছরের শেষ প্রান্তে এসে তড়িঘড়ি করে শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সব প্রকল্পের কর্মকর্তাকেই দ্রুত টাকা খরচের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' 'তথ্যানুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭৩টি প্রকল্পের জন্য মোট ৪ হাজার ১২৬ কোটি ৫৩ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে গত জানুয়ারি পর্যন্ত মোট অবমুক্ত করা হয়েছে দুই হাজার ৮৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫১ শতাংশে।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার মান উন্নয়ন বলতে শুধু ভবন নির্মাণ বোঝে কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রকৃত বেতন-স্কেল নির্ধারণ করাকে শিক্ষার উন্নয়ন বোঝে না। মেধাবী শিক্ষক ছাড়া যে প্রকৃত শিক্ষাদান চলে না। এ বোধ তাদের জন্মায় না। কারণ তারাও অদক্ষ ও অদূরদর্শী। পত্রিকার রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে– 'মাউশি'র অধীনে বাস্তবায়ন হওয়া সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (সেসিপ) মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে অ্যাকশন প্ল্যান (কর্মপরিকল্পনা) ১৬টি প্যাকেরজ আওয়ায় ক্রয়-কার্যক্রম (শিক্ষা উপকরণ) চলতি অর্থবছর যা সম্ভব পর হবে না। অথচ বিলাসবহুল গাড়ি কেনায় এর সিংহভাগ অর্থ ব্যয় হয়েছে। আর একদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৮০৫৫টি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা ১০-১৫ বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিককে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একই নিয়মনীতিতে পরিচালিত হচ্ছে একই কারিকুলাম সিলেবাস ও প্রশ্ন পদ্ধতি অনুসরণ করছে এবং শিক্ষার্থীরা বোর্ড থেকে একই মানের সার্টিফিকেট অর্জন করছে। আবার ঐ ৮০৫৫টি প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি নিয়ে অর্থাৎ সরকারি নিয়মনীতি মেনেই পরিচালিত হচ্ছে তাহলে এদের বেতন-ভাতাদি না দিয়ে শিক্ষাখাতে উদ্বৃত্ত টাকা হয় কি করে? শিক্ষাখাতের টাকা কেন বেশিরভাগই ভবন নির্মাণ গাড়ি কেনা ও নানাবিধ সরঞ্জামাদি ক্রয়ে ব্যয় করার নিমিত্ত নির্ধারিত হয় এসব কিসের আলামত দুর্নীতির নয় কি? হচ্ছেও তাই।

দেশের সব মানুষকে যদি ন্যূনতম শিক্ষার আওতায় আনতে হয় তবে এমপিওভুক্ত নন-এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড নন-রেজিস্টার্ড সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এই বিশাল কর্মযজ্ঞ পালন করবে।

একদিকে বেতন না-পাওয়ার সমস্যা অন্যদিকে শিক্ষক সমস্যা। সব প্রতিবেদনই বলছে বাড়ছে শিক্ষার্থী বাড়ছে না শিক্ষক, তাই শিক্ষক সংকট নিরসনের দাবিতে প্রায়শই শিক্ষার্থীদের চলছে মানববন্ধন। আবার অনার্স মাস্টার্স লেভেলে পাঠদানেও মান রক্ষা বা বৃদ্ধি নয় আর তড়িঘড়ি কোর্স শেষ করার মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে শুধুই পরীক্ষার্থী-শিক্ষার্থী নয়। আবার আর একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গণতন্ত্রহীনতার চর্চার হয়ে পড়ছে বন্ধ্যা। গবেষণায় স্বল্প ব্যয়ের কারণে ব্যাহত হচ্ছে মেধার চর্চা। এভাবেই সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে চতুর্মুখী সমস্যা। এ থেকে উতরণের পথ আছে কি?

হ্যাঁ আছে। এই উত্তরণের পথে থাকতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার যা ১৯৭২-এর সংবিধানে বিধৃত হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে– কাজেই সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যে আচরণ করছে– তা কোনো সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতাও সুবিচার নিশ্চিত করছে না।

সরকার সুবিচার আরও নিশ্চিত করছে না শিক্ষায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। কি নির্মম পরিহাস। যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, সেখানে শিক্ষা খাতে বাজেটে বরাদ্দ কমিয়ে আনছে সরকার; আর যে টুকু বরাদ্দ দিচ্ছে তা আমলা গোষ্ঠীর লুটপাট করে খাওয়ার মধ্য দিয়েই চলছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল বাজেটের ১৪.৬৭ শতাংশ, সেখানে পরের বছরে কমে হলো ১৩.৬১% তারপর ক্রমান্বয়ে ১৩.১৩% ১২.৩২%, ১১.৫১%, ১১.০৭ এবং সর্বশেষ এ-বছর তা কমে দাঁড়ায় ১০.৭ শতাংশে। জনগণ বাড়ছে, শিক্ষার্থী বাড়ছে অথচ বাজেটে ব্যয় ক্রমান্বয়ে কমছে-এ কোন সুবিচার?

শিক্ষা খাতের খরচটুকুও না করে, শিক্ষকদের বেতন ভাতাদি না দিয়ে সরকার 'পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে' যে-সংবিধান তা যেমন লঙ্ঘন করছে, তেমনি পরম করুণাময়ের পবিত্র গ্রন্থ কোরানের বাণীও অস্বীকার করছে যেমন 'শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগে তার পারিশ্রমিক দাও'। আবার একই কারিকুলাম, সিলেবাস পড়িয়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যে বেতন ভাতাদি দেয়া হয় তা কোনো বেতন স্কেল না। কেননা বেতন স্কেল থাকতে হবে প্রারম্ভিক ও শেষ, থাকতে হবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, বোনাস এবং পেনশন, এমপিওভুক্তদের তা দেয়া হয় না। তাই সুবিচার এখানেও নেই। একদিকে এমপিওভুক্তির লিখিত স্বীকারোক্তি দিয়ে তা যেমন বরখেলাপ করছে, অন্যদিকে এমপিওভুক্তদেরও পুরো বেতন স্কেল না দিয়েও তাই করছে। এটি পেশার প্রতি মারাত্মক অবমাননা। এখানেও লঙ্ঘিত হচ্ছে সংবিধানের উল্লিখিত সাম্যের সুললিত বাণী।

শিক্ষা খাতে বাজেটের ৩০% বরাদ্দ দাবি-কেন যৌক্তিক?

(১) যেহেতু গ্রামাঞ্চলের প্রায় সকল শিক্ষার্থী নিম্ন-আয়ের পরিবারের অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক মুটেমজুর এবং ঝরে পড়ার হার সেখানে খুবই বেশি-তাই এই হার কমাতে গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ১ হাজার টাকা শিক্ষা-ভাতা দিতে হবে। (পিতা-মাতার ২-এর অধিক সন্তানরা এ-সুযোগ পাবে না। দুজন পাবে। পিতা মাদকাসক্ত বা জুয়াড়ি হলেও পাবে না। অর্থ উত্তোলনে মা-কে সঙ্গে থাকতে হবে। স্কুল হেড মাস্টার ও শ্রেণী শিক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে শিক্ষার্থীর আইডেন্টিটি কার্ড দুর্নীতি রোধ করতে পারবে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতি তিন মাস অন্তর তা দিতে হবে। এবং একেবারেই ঠিকানাহীন শিশু কিশোরদের জন্য প্রতি উপজেলায় ১টি করে স্কুলসংলগ্ন হোস্টেল গড়ে তুলতে হবে থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্তসহ।

(২) যারা নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাইবে তাদের ভাতা দুই হাজার টাকা দিতে হবে দ্বাদশ পর্যন্ত বিজ্ঞান শাখায় থাকলে।

(৩) দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হতে হবে। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত।

(৪) প্রত্যেক স্কুলে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি থাকতে হবে। থাকতে হবে লাইব্রেরি, লাইব্রেরিয়ান পদ এবং সেখানে পড়ার সুযোগ। প্রত্যেক স্কুলে রান্নাঘর থাকতে হবে-যেখানে শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার রান্না করা যাবে এবং ছাত্রী-ছাত্রী সবার ৬ষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক গার্হস্থ-বিজ্ঞানের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের কার্যক্রমও চলতে পারবে।

(৫) যারা বিএসসি পড়বে তাদের শিক্ষা-প্রণোদনা ভাতা ৩০০০/- দিতে হবে।

(৬) যারা বিএসসি বা বিএ পড়ে স্কুল-শিক্ষকতা পেশায় আসবে জিপিএ (৩.৫-৪) গ্রেড পেয়ে তাদের শিক্ষা প্রণোদনা ৪০০০/- টাকা দিতে হবে এবং তাদের এডুকেশন এর ওপর ১টি বিশেষ অতিরিক্ত বিষয় পড়তে হবে। আর এ পেশার মানোন্নয়ন অর্থাৎ পৃথক বেতন-স্কেল দিতে হবে। শিক্ষককে তৃতীয় শ্রেণীর মর্যাদাদান জাতির জন্য কলঙ্কজনক।

(৭) যারা অনার্সে ভর্তি হবে-তাদের মেধাবৃত্তি ৫০০০/- হতে হবে। স্বল্প আয়ের পিতামাতার সন্তানদের মেধাবৃত্তি না পেলে ২০০০/- প্রণোদনা ভাতা দিতে হবে। ষাটের দশকে এ মেধা বৃদ্ধি ছিল ৭০%। তখন হলের মেসচার্জ ছিল ৪০% বুয়েটসহ প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের। সকালের নাস্কায় ২ আনায় ডিম মামলেট আর ২ আনায় ২ পরটা পাওয়া যেত। এখন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পড়ে প্রায় ৫০০০/।

(৮) যারা গ্রেড ২.৫ পেয়ে ভোকেশনালের বিভিন্ন শাখায় (প্রকৌশল, মেডিকেল, ডেন্টাল, কৃষি বা যে কোনো) যাবে- তাদের মেধাবৃত্তি (এক বছর পর) ৩০০০/- এবং সাধারণ বৃত্তি বা প্রণোদনা ভাতা ২০০০/- করে দিতে হবে।

(৯) মাস্টার্সের পর যারা গবেষণা করতে চাইবে তারা প্রভাষকের মর্যাদা পাবে এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে, তবে তার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে কাজের অগ্রগতির ওপর।

(১০) স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষকদের ল্যাব-এলাউন্স বেতনের তিন ভাগের এক বা চার ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। এতে বিজ্ঞান শিক্ষায় অনেকে আকৃষ্ট হবে এবং শিক্ষকতা পেশায় আসতে আগ্রহী হবে।

(১১) কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যারা শিক্ষকতার পেশায় আসতে চায়-শুধু তারাই মাস্টার্স করার সুযোগ পাবে এবং যাদের ফলাফল সবসময়ের জন্যই সর্বোচ্চ। যারা অন্য কোনো পেশায় যেতে আগ্রহী তাদের ৩ বছরের পাস বোর্স বা ৪ বছরের অনার্স কোর্স-শেষ ধাপ বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বিদ্যমান আছে।

দেশে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ৭৯টি। সরকারি মেডিকেল কলেজ ২৪টি আর প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ৬২টি। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ৩১৭ আর বেসরকারি স্কুল প্রায় ১৬০০। প্রাইভেট স্কুল ও আছে। আমাদের স্কুল ও কলেজসমূহ বেশিরভাগই বেসরকারি। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠানের আয় প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে, সম্প্রসারিত করার কাজে প্রতিষ্ঠানের ফান্ডে জমা হয়, কিন্তু বাণিজিক ভিত্তিতে প্রাইভেট মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয় খুশিমতো পকেটস্থ করে বাণিজ্যির স্ফীতি ঘটায় তাই এগুলোকে বেসরকারি না বলে প্রাইভেট বলাই ভালো।

কথা হলো বর্তমানে মেডিকেল কলেজে ভর্তি-পরীক্ষার মাধ্যমে মার্কসের ভিত্তিতে সরকারি ও প্রাইভেট সম্পন্ন করা হচ্ছে। তাই সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীরা যে অর্থের বিনিময়ে পড়াশোনা করে প্রাইভেটও সেই পরিমাণ অর্থই শিক্ষার্থীরা প্রদান করবে। বাকি যেটুকু প্রয়োজন সরকার তা দেবে। যেহেতু ব্যাংকের ৪ হাজার কোটি টাকা লোপাট হলে মাননীয় বিজ্ঞ অর্থমন্ত্রী তাচ্ছিল্যভাবে বলেন 'এটা কোনো টাকাই না', বাংলাদেশ ব্যাংকের সমুদর টাকা লুট করার জন্য সকল দুয়ার খুলে রাখা হয় ৮০০ কোটি টাকা 'এমন আর কি' ভেবে তাহলে শিক্ষার সকল ব্যয় ভার বা জাতীয় বাজেটের ৩০% ব্যয় করা 'এমন কিছুই না'।

শিক্ষার সার্বিক ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন করলে সমাজ অতি দ্রুত তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। শিশু যখন শিক্ষা ভাতা পাবে তখন ঐ অবহেলিত শিশুকে পিতামাতা যেমন বুকে টেনে নেবে তেমনি এতিম বলে যাদের দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছিল-আত্মীয় স্বজনরা তার অভিভাবকত্ব নেয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। রাস্তা-ঘাট স্টেশনে যেসব শিশু পড়ে থাকেন তখন তাদের ঠিকানা জুটে যাবে। কারণ তাদের হাত শুধু বই খাতা থাকবে না, থাকবে মাস মাস কিছু অর্থ এবং স্কুলে দুপুরে পেটপুরে খাবার। রাজীব, রাজন রাকীবদের মতো শিশু বয়সে শ্রম দিতে গিয়ে করুণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে না। এই স্কুল ফিডিং প্রকল্প ভারতেও ২০১০ সাল থেকে চলছে। তবে ছুটির দিনে ছিল না। সম্প্রতি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রাজ্য সরকারগুলোকে গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ও স্কুল শিক্ষার্থীদের খাবার সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে। বাংলাদেশে গ্রামে গ্রামে প্রতি স্কুলে রান্নাঘরসহ এই প্রকল্প চালু হলে বহু গ্রামের বহু রাঁধুনি ও বাবুর্চি কাজ পেয়ে উপকৃত হবে। শিশুরা শুধু নয়, তার গোটা পরিবার স্বস্তি আসবে। আসবে গ্রামজুড়ে।

সব শেষে বলতে চাই সবাইকে শিক্ষার আওতায় আনতে হলে পাঠ্যবই ১০০ কোটি বা তারও বেশি প্রয়োজন হবে। বিদেশ থেকে বা শুধু ঢাকা থেকে ছাপানো নয়– আধুনিক টেকনোলজিতে সব জেলা শহরে বই ছাপানোর দায়িত্ব দিয়ে প্রায় সব অঞ্চলকে কর্মক্ষম রাখতে হবে। দু-একজন বিলিয়নিয়র বানানোর চিন্তা বাদ দিতে হবে। শিক্ষায় ৩০% শতাংশ বিনিয়োগ প্রথম বছরেই আশ্চর্যজনক, ফল রাষ্ট্র পাবে যা ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখার মতোই লাভজনক বা তার চাইতেও অনেক বেশি।